বিদ্যুৎ মাশুল, শিক্ষায় ফি ও হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধি, বাড়তি খাজনা ও সেস,
ডিজেল-পেট্রলের সেস ও করবৃদ্ধি, বর্ধিত পরিবহন ভাড়া, বাড়তি ট্রেড লাইসেন্স ফি ইত্যাদি প্রত্যাহার,
বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, ছাঁটাই, লে-অফ, লকআউট বন্ধ করা, চটশিল্পের কালাচুক্তি
বাতিল করা ও অসংগঠিত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও কাজ দেওয়া প্রভৃতি দাবিতে

এস ইউ সি আই-এর ডাকে

২১ আগস্ট বাংলা বনধ সফল করুন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আবেদন

বন্ধুগণ,

আপনারা ভুক্তভোগী হিসাবে সকলেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন, কেন্দ্রের বি জে পি জোট সরকার ও রাজ্যের সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার উভয়েই একদিকে নানা জনবিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করে এবং অন্যদিকে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি ও ব্যবসাদারদের বেপরোয়া লুণ্ঠন করতে দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনে কী দুর্বিষহ সংকট সৃষ্টি করেছে। সকলেরই আজ এক দুর্ভাবনা, এভাবে চললে বাঁচব কি করে?

বিদ্যুতের বিল সাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যাচ্ছে

আপনারা জানেন, এস ইউ সি আই একমাত্র দল যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন লড়াই করে যাচ্ছে। গত ২৭শে জানুয়ারি জনগণের নানা দাবিতে এই দলের ডাকা ২৪ ঘন্টা বাংলা বন্ধ আপনারা বিপুলভাবে সাফল্যমণ্ডিত করায় শঙ্কিত রাজ্য সরকার কোর্টের মাধ্যমে ২০০০-২০০১ সালের বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল আদায় স্থগিত করিয়েছিল, যার ফলে গত ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত গ্রাহকদের কাছ থেকে কয়েক শত কোটি টাকা লুট করা বন্ধ করানো গিয়েছিল। কিন্তু এখন আবার আক্রমণ শুরু হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ২০০৩-২০০৪ সালের জন্য সরকারি এস ই বি এবং বেসরকারি সি ই এস সি-কে যথাক্রমে ইউনিট প্রতি ৫২ পয়সা এবং ২৫ পয়সা দামবৃদ্ধির অনুমতি দিয়েছে। রাজ্য সরকার যথারীতি ভাব দেখাচ্ছে, তাদের কিছু করার নেই। অথচ চাইলেই সরকার ৩৯ নং ধারা প্রয়োগ করে কমিশনের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারে। কিন্তু করবে না, দাম বাড়ুক এটাই তাদের কাম্য। ইতিমধ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার লোকসভায় ও বিধানসভায় নতুন বিদ্যুৎ আইন পাশ করেছে যাতে সব ধরনের সাবসিডি তুলে দেওয়া যায় এবং বিদ্যুৎ পরিষেবাকে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে যথেচ্ছ দাম বাড়িয়ে ব্যাপক লুটের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়। রাজ্য সরকার গা বাঁচানোর জন্য বোঝাচ্ছে তারা কেন্দ্রের আইনের বিরুদ্ধে, অথচ তাদের সম্মতি না থাকলে এটা হত না এবং তারা নিজেরাই অনুরূপ আইন পাশ করে বসে আছে। আরও কিছুদিনের মধ্যে ২০০২-২০০৩, ২০০৩-২০০৪ সালের নতুন মাশুল ঘোষণা করে এস ই বি এলাকায় ৬১% এবং সি ই এস সি এলাকায় ১৩% দাম বাড়ানোর ষড়যন্ত্র হচ্ছে। কৃষিতে বিদ্যুতের দাম বাড়বে ১০০%। এ ছাড়া ২০০০-২০০১ এবং ২০০১-০২ সালের জন্য ৩০% মাশুলবৃদ্ধির দাবিতে হাইকোর্টে মামলা চালানো হচ্ছে। ফলে আগামী দিনে বিদ্যুতের দাম ভয়ঙ্করভাবে বাড়বে। অন্যদিকে সিকিউরিটি ডিপোজিট অত্যধিক বাড়িয়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা লুটে নেওয়া হচ্ছে। ভুয়ো বিলের দ্বারা জালিয়াতিও চলছে, আর লোডশেডিংয়ের অত্যাচার তো অব্যাহত আছেই। বিদ্যুতের জন্য ব্যয় যেভাবে বাড়ছে, তাতে হয় সাধারণ গ্রাহকদের বিদ্যুৎহীন পুরনো জীবনে ফিরে যেতে হবে, আর না হলে আধপেটা থেকে, ধারদেনা করে বিল মেটাতে হবে। তাও বা কতদিন চলবে ? ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসাতেও লালবাতি জ্বলবে। ফলে এই অবস্থা কি চলতে দেওয়া যায়?

৬ আগস্ট ২০০২ঃ ভাড়াবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনে পুলিশি অত্যাচার

ট্রামও কি ডিজেলে চলে?

সরকার যে জনগণকে ঠকানোর ক্ষেত্রে কত ছলচাতুরির পথ নেয়, সেটা পরিষ্কার পরিবহন ভাড়াবৃদ্ধির ক্ষেত্রে। সরকার যেন সাগ্রহে বসে থাকে কখন আবার ডিজেলের দাম বাড়বে, আর অতি ব্যস্ততায় ভাড়া বাড়াবে। একবার হিসাব পরীক্ষাও করে দেখে না, তেলের দাম যা বাড়লো, তাতে মালিকদের অত্যধিক লাভ কিছু কমছে, না সত্যিই লোকসান হচ্ছে। এমনকি ডিজেলের দাম বাড়লে বিদ্যুৎচালিত ট্রামের ভাড়া বাড়াতেও এরা এতটুকু লজ্জাবোধ করে না। কিছুদিন আগে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বলে ৯% ভাড়া বাড়িয়েছিল, অথচ তার এতটুকু ব্যবস্থা করে নি। সেই টাকা কোথায় গেল কে জবাব দেবে ! সর্বশেষ ভাড়াবৃদ্ধির পর গত ১৫ই এপ্রিল থেকে কয়েক দফায় ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে ৩.১৫ টাকা কমা সত্ত্বেও সরকার নানা টালবাহানা করে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে পুরানো বর্ধিত ভাড়া আদায় করালো, পরে আমাদের দলের আন্দোলনের চাপে কিছুটা কমাতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ কমায় নি, যা কমিয়েছে তা এখনও বহু রুটে চালু করায় নি।

১৫ জুলাই সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলা বন্‌ধের ঘোষণা করছেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। পাশে কমরেড রণজিৎ ধর।

শিক্ষাবিস্তার নয়, শিক্ষা ধ্বংস করা হচ্ছে

আপনারা জানেন, এদেশে একদিন প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারীরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের স্বপ্ন ছিল ঘরে ঘরে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দেওয়া, মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে যুব সমাজকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী মননের অধিকারী করে গণতান্ত্রিক সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটানো। স্বদেশী যুগে ধ্বনিত হয়েছিল 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড', স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ অনেকেই সুদূর গ্রামাঞ্চলে গিয়েও শিক্ষা বিস্তারের ব্রত নিয়েছিলেন। তাঁদেরও স্বপ্ন ছিল, স্বাধীন ভারতে ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের জন্যই শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হবে, শিক্ষার ব্যয়ভার মূলত সরকারই বহন করবে। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ক্রমাগত শিক্ষা বাজেট কমাচ্ছে, শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব বহন করতে অস্বীকার করছে, সর্বস্তরে এমনকি স্কুল স্তরেও অত্যধিক ফি বাড়াচ্ছে, ডোনেশন নিচ্ছে, লক্ষ লক্ষ টাকার ক্যাপিটেশন ফি পর্যন্ত চালু করেছে। উভয় সরকারই ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিয়ে জ্ঞানসাধনার পবিত্র ক্ষেত্র বিদ্যালয়কে টাকা গুণে ডিগ্রি বেচাকেনার সওদাগরি দোকানে পর্যবসিত করছে। এভাবেই অতীতের সকল মনীষী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্ন ও সাধনাকে তারা ভূলুণ্ঠিত

এস ইউ সি আই
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

বুলেটিন

বুলেটিন - ২ ১৬ জুলাই ২০০৩ সাহায্য মূল্য ঃ ১ টাকা

২১ আগস্ট বাংলা বন্‌ধ সফল করুন

করছে। এর কারণ কী? একদিকে পুঁজিবাদী অত্যধিক শোষণে জর্জরিত জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় বাজারে তীব্র মন্দা চলছে, তাই কলকারখানা-অফিস বন্ধ হচ্ছে, ছাঁটাই চলছে, কোটি কোটি বেকার বাড়ছে। অশিক্ষিত বেকারদের 'অদৃষ্টের লিখন', 'কর্মফল' — এসব বুঝিয়ে ঠকানো যায়, কিন্তু শিক্ষিতদের যায় না। কারণ শিক্ষিত বেকারেরা বিক্ষোভের আগুন জ্বালতে পারে, তাই শিক্ষার ব্যয়ভার বাড়িয়ে ও ভর্তির সুযোগ কমিয়ে শিক্ষার সুযোগ সংকোচনের ষড়যন্ত্র। যার অঢেল টাকা আছে সেই পড়বে, আর যার নেই সে স্কুল-কলেজের রুদ্ধদ্বারে মাথা খুঁড়বে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার বৈজ্ঞানিক শিক্ষার পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব আরো বাড়াচ্ছে, ইতিহাসকে বিকৃত, সত্যবর্জিত ও অসত্যবহুল করছে যাতে অন্ধ ফ্যাসিস্ট মানসিকতা গড়া যায়, উগ্র ঐতিহ্যবাদ-সাম্প্রদায়িকতা-হিন্দুত্বকে উস্কানি দেওয়া যায়। রাজ্য সরকারও সেল্ফ এমপ্লয়মেন্টের ধুয়া তুলে স্পেশালাইজেশন ও টেকনিক্যাল শিক্ষার উপর কেন্দ্রের মতই গুরুত্ব দিচ্ছে। অথচ এই স্পেশালাইজেশন ও টেকনিক্যাল শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়ার বিরুদ্ধে আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মানুষকে মানুষ হওয়ার শিক্ষা দাও, কলকারখানার সামগ্রী করো না। মানুষ থেকেই প্রকৃত মানুষ জন্ম নেয়, যেমন আগুন থেকে আগুন জ্বলে। আর আইনস্টাইন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, স্পেশালাইজেশনের ফলে মানুষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত কুকুর হবে, শিক্ষিত মেশিন হবে, মূল্যবোধসম্পন্ন চরিত্রবান মানুষ হবে না। ফলে বিজেপি ও সি পি এমের শিক্ষানীতি কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এটা পরিষ্কার। আবার টেকনিক্যাল শিক্ষা পেলে চাকরি পাবে এটাও ঠিক নয়। তাহলে এত ইঞ্জিনিয়ার বেকার কেন? অন্যদিকে চাকুরি দেবার দায়িত্ব অস্বীকার করে বেকারদের 'নিজে করে খাও' ঐদিকে ঠেলবার জন্যই স্বনিযুক্তি প্রকল্পের স্লোগান। পশ্চিমবঙ্গ অতীতে শিক্ষায় দেশে ১ম স্থানে ছিল, আজ নামতে নামতে ১৮তম স্থানে নেমেছে, স্কুল স্তরেই ৮৩% ছাত্রের ড্রপ আউট হচ্ছে, এমনিই রাজ্য সরকারের কৃতিত্ব। স্কুলে-কলেজে হাজার হাজার শিক্ষকের পদ খালি, স্বল্প বেতনে পার্টটাইম টিচার দিয়ে চালানো হচ্ছে। রাজ্য সরকার বিজেপি, কংগ্রেসের পথেই প্রাইমারি স্তর থেকে ইংরেজি তুলে দিয়ে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ের সর্বনাশ করেছে, আমাদের দলের আন্দোলনের চাপে শেষপর্যন্ত চালু করতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু পাশ-ফেল প্রথা এখনও চালু করেনি, বরং ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। বেসরকারি উদ্যোগে আমাদের দলের কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে বৃত্তি পরীক্ষা চালাচ্ছে সরকার তাকেও বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রাইমারি স্তরে ডি পি ই পি, সর্বশিক্ষা অভিযান, শিশুশিক্ষা কেন্দ্র চালু করে শিক্ষার যতটুক ভিত ছিল তাও সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলছে। ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নীতি শিক্ষা বিস্তারের নয়, শিক্ষা ধ্বংসের। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সতর্ক করে বহু যুগ আগে ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভাষায় রামমোহন ও তলস্তয় বলেছিলেন, জনগণের অজ্ঞানতাই স্বৈরাচারী শাসকের শক্তি। অর্থাৎ বিজেপি ও সি পি এম সরকারকে টিঁকে থাকতে হলে জনগণকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখতে হবে, তাহলে প্রশ্ন উঠবে না, প্রতিবাদ হবে না। তাঁরা ও শোষকশ্রেণী নিশ্চিন্তে শোষণ-অত্যাচার চালিয়ে যাবে, আর ধর্মান্ধ মানুষ 'পূর্বজন্মের পাপের ফল', 'বিধাতার বিধান' বলে সবকিছু নির্বিচারে মেনে নেবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এই ষড়যন্ত্রকে কি চলতে দেওয়া যায় ?

শিশুমৃত্যু সরকারি নিষ্ঠুরতারই পরিচয়

হাসপাতালের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অসাধারণ অগ্রগতির যুগেও লক্ষ লক্ষ গরিব বাবা-মাকে মুমূর্ষু সন্তানকে কোলে নিয়ে 'রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে' এই মধ্যযুগীয় সান্ত্বনাকে অবলম্বন করে অঝোরে কাঁদতে হয়, অত্যধিক ওষুধের দাম, ডাক্তারের ফি ও পথ্য যোগানোর সামর্থ্য তাদের নেই। তবুও এতদিন শহরাঞ্চলে যে যৎসামান্য চিকিৎসার সুযোগ ছিল নানা খাতে ফি ও চার্জ চালু করে ও বাড়িয়ে, নানা বিভাগ পরিকল্পিতভাবে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে সরকারি হাসপাতালগুলিকে নার্সিং হোম বানানো হচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য বাজেট বাড়ানো তো দূরের কথা, বারবার কমাচ্ছে। কেন্দ্র নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের রাজধানী, জেলা ও মহকুমা শহরের হাসপাতালগুলির চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয় রুগীরাই বহন করবে, সরকার কিছুই আর দেবে না, শুধু প্রাইমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র সরকার চালাবে। রাজ্য সরকার এই হুকুম তামিল করে আরও একধাপ এগিয়ে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেবে বলেছে এবং দুই-তৃতীয়াংশ প্রাইমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ইন্ডোর চিকিৎসা বন্ধ করে দিচ্ছে। ফলে এখানেও একই অবস্থা। যার অনেক টাকা দেওয়ার ক্ষমতা আছে সে চিকিৎসা পাবে, যার নেই তাকে বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে। ফলে প্রতিটি হাসপাতালেই এক মর্মান্তিক দৃশ্য। হাসপাতালগুলিতে উপযুক্ত ডাক্তার নেই, সাজসরঞ্জাম-ওষুধপত্র নেই, চলছে ব্যাপক দুর্নীতি ও সরকারি অবহেলা। চুক্তিভিত্তিক ডাক্তার-নার্স ও কর্মচারী নিয়োগ চলছে। এই সরকার যে কত নিষ্ঠুর সেটা বি সি রায় শিশু হাসপাতালের পর মুর্শিদাবাদের হাসপাতালে শিশুমৃত্যুর ঘটনায় আবার দেখা গেল। মাসাধিককাল ধরে অজানা জ্বর অজানাই থেকে গেল, শিশুরা মরতেই থাকল, মন্ত্রীদের টনক নড়লো না, দেশ-বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ শিশু চিকিৎসক আনার উদ্যোগ নিল না। এই মন্ত্রীদের সন্তানদের সর্দিকাশি হলে সরকারি টাকায় নামী নার্সিং হোমে পাঠায়, বিদেশে পাঠায়, আর এই গরিব ছেলেমেয়েদের জীবনের দাম কি, তাদের জন্য কার অত মাথা ব্যথা ? যখন ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়ে গেল, চারদিকে প্রশ্ন উঠলো, তখন মুখ্যমন্ত্রী বিলেত ঘুরে এসে রিপোর্টার-ফটোগ্রাফার নিয়ে বহরমপুরে দর্শন দিলেন। আমাদের দলের মহিলারা সেদিন শোক মিছিল করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলো। আমাদের দলের ডাকা ২৩শে জুনের ২৪ ঘন্টা মুর্শিদাবাদ বন্‌ধ ভাঙার জন্য বিশাল পুলিশবাহিনী ও র‍্যাফ নামিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হল, তাতেও বন্‌ধ সর্বা-ত্মক সফল হল। মুখ্যমন্ত্রী কিছু শুকনো প্রতিশ্রুতি দিলেন, যেমন বি সি রায় হাসপাতালের ক্ষেত্রে দিয়েও কিছুই করেন নি। আর কিছু ডাক্তারকে বলির পাঁঠা করে সকল দায় চাপিয়ে সরকারের দায়িত্ব এড়ানোর অপচেষ্টা করলেন। ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ করছে।

শ্রমিক জীবনের নিদারুণ যন্ত্রণার খবর কে রাখে ?

রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারীরাও দেশি-বিদেশি পুঁজি ও কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের সম্মিলিত আক্রমণে ভয়ঙ্কর সঙ্কটে ধুঁকছে। হাজার হাজার কলকারখানা-অফিস বন্ধ হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই হচ্ছে, নূতন মেসিন বসিয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের 'সারপ্লাস' করে বরখাস্ত করছে, জবরদস্তি রিটায়ার করাচ্ছে, শূন্য পদে নিয়োগ বন্ধ ও পদ বাতিল করছে, কন্ট্রাক্ট লেবার প্রথা চালু করছে, ক্যাজুয়াল প্রথা, অস্থায়ী নিয়োগ, ৮ ঘন্টার অধিক কাজ চাপিয়ে দিচ্ছে। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালাচুক্তি চালু করাচ্ছে, সরকারি কারখানা বেসরকারিকরণ করছে, শ্রমিক কর্মচারীদের অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে। শ্রমিকদের প্রাপ্য পি এফের টাকা ফাঁকি দেওয়ায় এই রাজ্য এখন শীর্ষস্থানে। শুধু মালিকরাই নয়, সরকারও এই টাকা দিচ্ছে না। অসংগঠিত শ্রমিকদের পি-এফ চালু করার কথা ঘোষণা করলেও বাস্তবে তা চালু করেনি এবং সরকার নিজেও এ খাতে কয়েক কোটি টাকা দেয়নি। শুধু কেন্দ্রই নয়, রাজ্য সরকারও শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিচ্ছে। সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য ডি এ, বোনাস থেকে বঞ্চিত করছে, দাবি তুললে দমন করছে। মালিকরা নিজেদের স্বার্থে যেকোন আইন, যেকোন চুক্তি ভাঙতে পারে, পি এফের টাকা মারতে পারে, যেকোন জুলুম-অত্যাচার চালাতে পারে, যখন তখন ক্লোজার-ছাঁটাই করতে পারে, এতে সরকারের আপত্তি নেই। কিন্তু শ্রমিক-কর্মচারীরা আন্দোলন করলে 'শিল্পে শান্তি নষ্ট হচ্ছে' এই ধুয়া তুলে পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে, নির্বিচারে লাঠি গুলি চালায়। ধুয়া তুলেছে, 'শ্রমিক অশান্তির' জন্যই নাকি এ রাজ্যে 'শিল্পায়ন' হচ্ছে না। অথচ পাঁচ ও ছয়ের দশকে এই রাজ্য যখন ভারতে শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্বে ছিল, তখন শিল্পের ক্ষেত্রেও এ রাজ্য শীর্ষস্থানে ছিল, আর এখন এই রাজ্য কারখানা লকআউটে অনেক এগিয়ে এবং শ্রমিক ধর্মঘটে অনেক পেছনে। অসংগঠিত শ্রমিকদের দুরবস্থা আরও চরমে। দিনে রাতে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে রিক্সা-ভ্যান চালিয়ে, বিড়ি বেঁধে, মাটি কেটে, ইট ভাটায় কাজ করে, রাজমিস্ত্রির কাজ করে, শাকসব্জি বেচে, কুলিগিরি করে, আরও নানাভাবে লক্ষ লক্ষ গরিব কোনরকমে বেঁচে থাকার জন্য লড়ছে। এদের জন্য না আছে কোন আইন, না আছে কাজের স্থায়িত্ব ও ন্যায্য মজুরি, যা রোজগার তাতে পেট চলে না। আরও কয়েক হাজার গরিব হকারি করে দিন চালাবার সংগ্রাম করছে, যাদেরও উৎখাত করা হচ্ছে। ফলে একদিকে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা, বড় বড় ব্যবসাদাররা সরকারের সাহায্যে কোটি কোটি টাকা লুটছে, অন্যদিকে কত লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী অনাহারে-অর্ধাহারে-বিনা চিকিৎসায় মরণ যন্ত্রণায় ছটফট করছে, অনেকে পাগল হয়ে যাচ্ছে, অনেকে সপরিবারে আত্মহত্যাও করছে, এসবের খবর কে রাখে!

গ্রাম এখন শ্মশানপুরী

গ্রামাঞ্চলের অবস্থা আরও ভয়ংকর। বিদ্যুৎ, ডিজেল, সার, কীটনাশকের দাম ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য পণ্যের মূল্য বাড়ছেই। বন্যায়-খরায়-ঝড়ে বারবার চাষ মার খাচ্ছে, ধারদেনা করে চাষ করতে হচ্ছে, কিন্তু ফসলের ন্যায্য দাম চাষিরা পায় না। সরকার ঘোষিত ফসলের দাম পায় আড়তদার-মিল মালিকরা — চাষিরা নয়। ফলে দেনার দায়ে, অভাব-অনটনে অনেকেই জমিজমা বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে, এমনকি আত্মহত্যাও করছে। জমিচ্যুত খেতমজুরের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, কিন্তু সারা বছর স্থায়ী কাজ ও ন্যায্য মজুরি নেই। অধিকাংশ গরিবকে বি.পি.এল লিস্ট থেকে বাদ দেওয়ার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মাপকাঠি হিসাবে দৈনিক আয় মাত্র ৯.১৫ টাকা ধার্য করেছে, একজন রাস্তার ভিখারিরও এতে চলে না। আবার এই লিস্ট করা নিয়ে দলবাজি-কারচুপি চলছে। সেচ কর, সেস, খাজনা, মিউটেশান-রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদি এত বাড়িয়েছে যে শেষপর্যন্ত জমি বেচে এসব মেটাতে হবে, তাতেও কুলোবে না। এইভাবে সরকার কৃষকদের রক্ত নিংড়ে টাকা তুলছে। অন্যদিকে মাঝারি ও গরিব চাষিদের অবলুপ্ত করে বড় বড় কৃষি ফার্ম গড়ে কৃষিক্ষেত্রকে দেশীয় একচেটিয়া ও বিদেশী মাল্টিন্যাশানালদের লুণ্ঠন ক্ষেত্রে পরিণত করছে, সেজন্য ল্যাণ্ড সিলিং তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। শাসক দলের গ্রামীণ ভোট ব্যাঙ্ক পঞ্চায়েত, স্থানীয় সি পি এম নেতা-জোতদার-ব্যবসাদার-সুদখোর-কন্ট্রাকটর-পুলিশ-আমলা-ক্রিমিনালদের এক দুষ্টচক্রে পরিণত হয়েছে। এই চক্র গ্রামাঞ্চলে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে গ্রামীণ জীবনকে অক্টোপাসের মত বেঁধে রেখেছে, যেন এর হাত থেকে কারও রেহাই নেই। এই চক্র পঞ্চায়েতের উন্নয়ন খাতের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করছে। এই চক্রের দাপটে ও সরকারী দলগুলির প্রভাবে গ্রামীণ জীবনে যতটুকু ন্যায়-ধর্ম, কর্তব্যবোধ-দায়িত্ববোধের অস্তিত্ব ছিল, সেটাও লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপক দুর্নীতি, অনাচার-ব্যাভিচার-স্বার্থপরতা গ্রামীণ জীবনকেও শেষ করে দিচ্ছে। সর্বস্ব খুইয়ে প্রতিদিন কাতারে কাতারে গ্রামের মানুষ ছুটছে শহরের দিকে। কিন্তু সেখানেও ঠাঁই কোথায়, গাছতলায়-ফুটপাথে-প্ল্যাটফর্মে আশ্রয় নিচ্ছে। যেসব ঝুপড়িতে একদল মাথা গুঁজেছিল, সেগুলি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। একদল নরপশুরা গরিব বাবা-মার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের বাইরে চালান করে দিচ্ছে। এদের কিডনি বেচে ব্যবসা হবে। আরেক দল বিয়ের ছলনা করে বা চাকরির টোপ দিয়ে মেয়েদের বাইরে এনে পাচার করে দিচ্ছে দেহবিক্রির বাজারে। নারী-শিশু পাচারে লিপ্ত এইসব এজেন্টদের চালায় আরেকদল অসাধু বড় ব্যবসায়ী, যারা আবার সমাজের গণ্যমান্য মাথা, এরা শাসক দলকে মোটা টাকা দেয়। ফুটপাতে কত শিশু জন্মায় যারা জানেও না কোন গ্রামে তাদের ঠিকানা, কি তাদের পরিচয়। এ দুনিয়ায় স্নেহ-মমতা বলে কিছু আছে সে খবরও তারা পায়না। একদিকে এই দুঃখময় অন্ধকারের ছবি, অন্যদিকে সরকারের ঝলমলে বিজ্ঞাপন — তাদের সুশাসনের দৌলতে গ্রামাঞ্চল কি রকম স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। বাস্তবে স্বর্গরাজ্য নয়, গ্রামাঞ্চল এখন শ্মশানপুরীর মত খাঁ খাঁ করছে।

সরকারি অপকর্মে তৈরি করা ঘাটতি জনগণের ঘাড় ভেঙে পূরণ করা হচ্ছে

অন্যান্য রাজ্যের মত এরাজ্যেও ব্যবসাদার-মজুতদার-কালোবাজারিরা সরকারি দলের নেতা-মন্ত্রী ও অফিসারদের মোটা দক্ষিণা দিয়ে সব জিনিসেরই দাম বাড়িয়ে চলেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম প্রতিদিন এত আগুন হচ্ছে যে কি করে সংসার চালাবে, কেউই কুলকিনারা পাচ্ছে না। প্রশাসনের সর্বস্তরে ব্যাপক ঘুষ-দুর্নীতি, কর্তব্যে গাফিলতি অবাধেই চলছে। এরাজ্যের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেও স্বজনপোষণ, কাটমানি নেওয়া, পাবলিক মানি আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে। কেন্দ্রের মত এই সরকারও মন্ত্রী ও উচ্চ আমলাদের বেতনে-ভাতায়-বিলাসবহুল জীবনে অঢেল ব্যয় করে, ক্রমাগত

২১ আগস্ট বাংলা বন্‌ধ সফল করুন

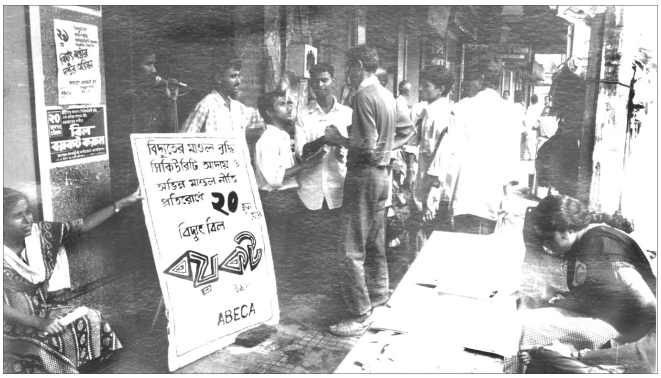

২০ জুন, ২০০৩ বিল বয়কট

পুলিশ বাজেট বাড়িয়ে, বড় বড় শিল্পপতি-ব্যবসাদারদের থেকে প্রাপ্য বহু কোটি টাকা ছাড় দিয়ে এবং ভোটে দলীয় কাজে বিপুল সরকারী টাকা ব্যয় করে বাজেটে ব্যাপক ঘাটতি করছে। আর নানা ট্যাক্স চাপিয়ে, কোর্ট ফি বাড়িয়ে, ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিসমেণ্ট ফি বাড়িয়ে, শহরে খাজনা চালু করে ও জল কর বসিয়ে, ট্রেড লাইসেন্স ফি বাড়িয়ে, পুনরায় পেট্রল-ডিজেলের ট্যাক্স বাড়িয়ে, এবং নানাভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে এই ঘাটতি পূরণের টাকা পাবলিক থেকে উশুল করছে।

গদির স্বার্থেই সন্ত্রাস

অন্যান্য রাজ্যের বুর্জোয়া দলগুলির মতই এরাজ্যেও সি পি এম নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে। গণতন্ত্রের যেমন 'বাই দি পিপল, ফর দি পিপল, অব দি পিপল' এই সংজ্ঞা এখন পাঠ্যপুস্তকে থাকে, বাস্তবে 'অবাধ', 'নিরপেক্ষ', 'শান্তিপূর্ণ' নির্বাচনের নামে 'বাই দি, ফর দি, অব দি মানি পাওয়ার এণ্ড ম্যাসল পাওয়ার' চলে, এ রাজ্যেও সেটা আরও সুনিপুণ ও সুসংগঠিতভাবে সি পি এম নেতৃত্ব চালাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনকে দলীয় দপ্তরে পরিণত করে পাকা হাতে রিগিং করানো —এসব বিদ্যায় এ রাজ্য অনেকের থেকে অনেক এগিয়ে। পুলিশ-প্রশাসনকে দলীয় কণ্ট্রোলে এনে বিরোধীদের উপর নিপীড়ন, তাদের সাজানো মামলায় ফাঁসানো, দলীয় কর্মীদের সাতখুন মাফ করানো, — সবই চলছে। দাগী ক্রিমিনালদের সরকারি দল ও পুলিশের প্রটেকশান দিয়ে ভোটের কাজে লাগাচ্ছে। ফলে খুন, ডাকাতি, ধর্ষণ, রাজনৈতিক হত্যা বেড়েই চলেছে। মধ্যযুগে সামন্তপ্রভুরা যেমন প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করার জন্য তাদের স্ত্রীদের ইজ্জতহানি করাতো, আজ এ রাজ্যে সি পি এম কোথাও কোথাও সেটাই করাচ্ছে। ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকার জন্য এরা এতদূর নামতে পারে ! এভাবেই সমগ্র রাজ্যে এক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের রাজত্ব তারা কায়েম করেছে।

'বামপন্থী' নামের সরকার থাকলেই বামপন্থা বাঁচেনা

অবিভক্ত বাংলা এবং পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ লড়াই-আন্দোলনের পীঠস্থান ছিল। সাম্রাজ্যবাদীরা এই বাংলাকে আতঙ্কের চোখে দেখত। এখানেই ভারতীয় রেনেশাঁর সূর্যোদয় ঘটেছিল, ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লববাদের জন্ম এখানেই হয়েছিল, কলকাতা ছিল তার প্রাণকেন্দ্র। পরবর্তীকালে এই সংগ্রামী ধারাই রুশ বিপ্লব, চীন ও ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের প্রভাবে বামপন্থা ও কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকেছিল, যাকে আত্মসাৎ করেই প্রথমে সি পি আই ও পরে সি পি এম শক্তি বাড়িয়েছিল। পাঁচ ও ছয়ের দশকে এই আন্দোলনের জোয়ার দেখে শঙ্কিত টাটা-বিড়লাই শুধু নয়, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীও আতঙ্কে কলকাতাকে 'মিছিল নগরী', 'দুঃস্বপ্নের নগরী' বলে অভিহিত করেছিলেন। কংগ্রেস সরকার অনেক লাঠি-গুলি চালিয়েও এখানকার লড়াইয়ের আগুন নেভাতে পারেনি। কিন্তু ওরা যা পারেনি, রাইটার্সের মসনদে দীর্ঘদিন আসীন থাকার লোভে দেশি-বিদেশি পুঁজিকে তুষ্ট করার জন্য আজ সি পি এম তাই করছে। একদিকে দলের কর্মী-সমর্থকদের নৈতিক অধঃপতন ঘটাচ্ছে, সংগ্রামী মানসিকতা নষ্ট করছে, পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে রাইটার্স পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে ক্ষমতা কুক্ষিগত করাই বামপন্থার একমাত্র লক্ষ্য বলে নির্ধারিত করছে। লোভনীয় জালে বহু কর্মীকে বেঁধে ফেলেছে, বাড়ি-গাড়ি-ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, প্রমোটারি, কণ্ট্রাক্টরি হতে শুরু করে নানা রুজি-রোজগারের ধান্দায় অনেককেই ফাঁসিয়েছে — বিলাসী জীবনে এদের জড়িয়েছে, আর তাদের ভয় দেখাচ্ছে আন্দোলন করলে এসব থাকবে না, সরকারকে ফেলে দেবে। এখনও কর্মীদের যে অংশ এই অসৎ পথে যায় নি, যাদের বামপন্থার প্রতি এখনও আস্থা আছে, তাদের বোঝাচ্ছে দেশে সাম্প্রদায়িকতা ও দক্ষিণপন্থার বিপদ বাড়ছে, ফলে বামফ্রণ্ট সরকার না থাকলে এ রাজ্যে বামপন্থা থাকবে না। যেন সরকার থাকার উপরই বামপন্থার অস্তিত্ব নির্ভর করছে, যেন পাঁচ ও ছয়ের দশকে এ রাজ্যে বামপন্থা ছিল না। যেন 'বামপন্থী' নামধারী কোন সরকার থাকলেই বামপন্থা থাকে, দক্ষিণপন্থী সরকারের সাথে বামপন্থী সরকারের কার্যকলাপের কোন মৌলিক পার্থক্য থাকার দরকার হয় না। বাস্তবে এ রাজ্যে 'বামপন্থী' সরকার শক্তিশালী হচ্ছে শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের আশীর্বাদে, গণআন্দোলন দমন করে, সন্ত্রাসের রাজ কায়েম করে, কিন্তু প্রকৃত বামপন্থা মরছে, আন্দোলন-লড়াই ধ্বংস হচ্ছে। ফলে বামপন্থার সংগ্রামী ঐতিহ্য ও গৌরবকে ধ্বংস করে সি পি এম বাস্তবে এ রাজ্যেও দক্ষিণপন্থা ও সাম্প্রদায়িকতার জমি তৈরি করে দিচ্ছে, যা ৪০/৫০ বছর আগে ভাবাও যেত না। তাই দেখা যায় যে পুঁজিপতি-ব্যবসাদাররা '৬৭ সালে গণআন্দোলনের হাতিয়ার যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে ৯ মাসের মধ্যেই ভেঙে দিল, আজ তারাই মহা ভরসায় 'বামফ্রণ্ট সরকার'কে ২৬ বছর ধরে জেতাচ্ছে। সরকার পরিচালনায় সি পি এমের 'বামপন্থার' সাথে বিজেপি-কংগ্রেস ও অন্যদের দক্ষিণপন্থার কোন পার্থক্য নেই। পুঁজিপতিদের আশ্বস্ত করার জন্যই সি পি এম ওদের 'দুঃস্বপ্নের নগরী'তে মিটিং-মিছিল মুক্ত করার জন্য নানা বিধিনিষেধ আনছে।

মনুষ্যত্ব ধ্বংসের সার্বিক পরিকল্পনা

এখানেই শেষ নয়। আরও ভয়াবহ আক্রমণ আছে। আমাদের মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ একদিন গভীর দুঃখে বলেছিলেন, একটা জাতি অনাহারে-অর্ধাহারে থেকেও মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারে, লড়াই করতে পারে যদি তার নৈতিক বল থাকে। ভারতবর্ষের শোষকশ্রেণী ও সরকারি দলগুলো সেই নৈতিক বলকে খতম করার ষড়যন্ত্র করছে। তাঁর এই ওয়ার্নিং আজ আরও কত মর্মান্তিক বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবিভক্ত ভারতে এই বাংলার যে যৌবন বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-দেশবন্ধু-সুভাষচন্দ্র-নজরুলের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' গণ্য করে 'ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান' গেয়ে সমগ্র দেশের ঘুম ভাঙিয়েছিল, সাম্রাজ্যবাদের ভিত কাঁপিয়ে তুলেছিল, আজ সেই যৌবন কোথায়? স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল মাদকদ্রব্য বর্জন করে, আর এখন সি পি এম সরকার সর্বত্র অঢেল মদের দোকান খুলে দিচ্ছে। তাই আজ মদ-ড্রাগ-সাট্টা-জুয়া-ব্লু-ফিল্ম - যৌন সাহিত্য-ক্যাবারে ডান্সের স্রোতে চরিত্র-মনুষ্যত্ব সবকিছু ভেসে যাচ্ছে। পুঁজিপতিশ্রেণী, সকল সরকারি দল ও সি পি এম শঙ্কিত, আবার যেন ক্ষুদিরাম-সূর্যসেন-প্রীতিলতারা তাদের চোখের ঘুম কেড়ে না নেয়। তাই ষড়যন্ত্র, যাতে ছাত্র-যুবকরা মনুষ্যবর্জিত পশুশক্তিতে পরিণত হয়, যাদের একদিকে অসাধু ব্যবসায়ীরা স্মাগলিংয়ে, ওয়াগন ভাঙায় ও নারী-শিশু পাচারে, অন্যদিকে রাজনীতির কারবারীরা সন্ত্রাস সৃষ্টিতে, আন্দোলন ভাঙ্গায়, রাজনৈতিক খুনে এবং রিগিংয়ে ব্যবহার করতে পারে। স্বদেশী যুগে নেতারা গার্জিয়ান হিসাবে ছেলেমেয়েদের মনুষ্যত্ব অর্জনের পথ দেখাত, আর এরা গার্জিয়ান হিসাবে আজ মনুষ্যত্ব বর্জনের পথ দেখাচ্ছে, যার পরিণতিতে আজ পথেঘাটে মত্ত যৌবনের বেপরোয়া উন্মত্ততা, ইজ্জৎ বিপন্ন নারীর আর্তনাদ, তুচ্ছ কারণে খুনোখুনি সবই স্বাভাবিক দৈনন্দিন চিত্র। এর বিষময় প্রভাব পারিবারিক জীবনেও পড়ছে। নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা- কর্তব্যবোধহীনতা, ভোগসর্বস্ব অনৈতিক জীবনযাত্রা, প্রচণ্ড স্বার্থপরতা, স্নেহ-মমতাহীনতা, নিষ্ঠুরতা পারিবারিক শান্তির স্বপ্নকে চুরমার করছে।

এই অবস্থায় আন্দোলনই একমাত্র পথ কেন ?

দেশের ও এই রাজ্যের এই সর্বাত্মক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি কি চলতেই থাকবে? কিছুই কি করার নেই? তাহলে এর শেষ কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আমাদের, অত্যাচারিত জনগণকে। আমরা যদি শোষণে-নির্যাতনে-অত্যাচারে মার খেয়ে খেয়ে ব্যথায়-হতাশায়-ক্ষোভে গুমরাতে থাকি, দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকি, 'কি আর করা যাবে', 'কিছু করা যাবে না' বলে ভাবতে থাকি, তাহলে এই সঙ্কট আরও বাড়তেই থাকবে। অত্যাচারী যদি দেখে প্রতিবাদ করার, মাথা তুলে বাধা দেওয়ার কেউ নেই, সবাই মাথা নিচু করে সারেণ্ডার করছে, থ্রেটের সামনে ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে, তখন সে আরও বেপরোয়া জোর-জুলুম-অত্যাচার-শোষণ চালাবে। আর যদি সে দেখে এখনও প্রতিবাদ করার মত মানুষ আছে, আন্দোলন হচ্ছে, সহজে মেনে নেবে না, তখন নূতন আক্রমণ করার আগে তাকে দশবার ভাবতে হবে। দ্বিতীয়ত, একমাত্র আন্দোলনের দ্বারাই কিছু আক্রমণ ঠেকানো যায়, কিছু দাবি আদায় করা যায়। যেমন অনেকেই তখন ভেবেছিল, সি পি এম সরকার যখন একবার প্রাইমারি থেকে ইংরেজি তুলে দিয়েছে, এ আর চালু করা যাবে না। ইংরেজরা যেমন বঙ্গভঙ্গের সময় বলেছিল তেমনি সি পি এম তখন বলেছিল ইংরেজি তোলা settled fact, আর মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এস ইউ সি আই জবাব দিয়েছিল, আন্দোলনের জোরেই এই সিদ্ধান্তকে unsettle করা হবে, হলোও তাই। ওরা কম বাধা দেয়নি, তা সত্ত্বেও আমাদের দল পরিচালিত ১৯ বছরের লড়াইয়ের চাপেই রাইটার্সের সিংহাসনধারীদের শেষপর্যন্ত মাথা নিচু করে ইংরেজি চালু করতে হয়েছে। আমাদের দল গণআন্দোলনের জোরেই এক দশকেরও বেশি লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ের বৃত্তি পরীক্ষা করাচ্ছে, প্রশাসন বাধা দিয়েও আটকাতে পারছে না। আমাদের দলের আন্দোলনের চাপেই আটের দশকে কয়েকবার এবং বর্তমান বৎসরে পুনরায় পরিবহন ভাড়া সরকার কিছু কমাতে বাধ্য হয়েছে। এভাবে হাসপাতালেও কিছু ফি ও চার্জ কমানো গেছে। ফ্রি চিকিৎসার সুযোগের সর্বনিম্ন আয়ের পরিমাণ ১৫০০ থেকে ২০০০ করানো গেছে। এ বছর ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বাড়তি বিদ্যুৎ মাশুল আদায় স্থগিত করানো গেছে। কিছু কারখানায় শ্রমিকদের দাবি আদায় করা গেছে। গ্রামাঞ্চলেও কৃষক ও খেতমজুরদের কিছু দাবি আদায় করা গেছে। বেশকিছু স্কুল-কলেজে বর্ধিত ফি কমানো গেছে ও ছাত্রদের ভর্তির সুযোগ করানো হয়েছে। এসব কোন সাফল্যই ত আন্দোলন ছাড়া করা যেত না। এছাড়া বিভিন্ন জেলায় ও স্থানীয় স্তরেও আন্দোলনের জোরে আমরা বহু দাবি আদায় করতে পেরেছি। তৃতীয়ত, সকল যুগের বড়মানুষেরা সকলেই বলে গেছেন, যেকোন মূল্যে এমনকি একাকী হলেও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহসের সাথে মাথা তুলে দাঁড়াতে, তা না হলে চরিত্র গড়ে ওঠে না, মনুষ্যত্ব থাকে না, মানুষ বলে পরিচয় দেবার কিছু থাকে না। তাই আপাতত দাবি আদায় হোক আর না হোক, সম্ভ্রম নিয়ে দাঁড়াবার স্বার্থে, উন্নত চরিত্র অর্জনের স্বার্থে আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই যুগে যে স্বপ্ন নিয়ে গোটা রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ একাকী দাঁড়িয়ে লড়েছিলেন, সে কি আজও পূরণ হয়েছে? যে স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে আত্মবলিদান করলেন, নেতাজী লড়াই করলেন, সে কি অর্জিত হয়েছে? তাহলে এই সংগ্রামগুলি কি ব্যর্থ? তাহলে আজও এঁদের নাম এত শ্রদ্ধার সাথে আমরা উচ্চারণ করছি কি করে? এভাবেই সমাজে মনুষ্যত্বের দীপশিখা প্রজ্বলিত থাকে, প্রতিবাদের কারেণ্ট বেঁচে থাকে; এক মনুষ্যত্বের শিখা বহু মানুষকে প্রজ্বলিত করে, এক মহৎ সংগ্রামী চরিত্র, এক মহান আন্দোলন যুগের পর যুগ বহু চরিত্রকে, বহু আন্দোলনকে প্রেরণা দেয়, পথ দেখায়, এক আন্দোলনের অসম্পূর্ণ স্বপ্ন পরবর্তী আন্দোলন সফল করে। এ না হলে সমাজ-সভ্যতার অগ্রগতি থাকে না, বিবেক-মনুষ্যত্ব বলে কিছু থাকে না, মানুষ আর পশুতে কোন পার্থক্য থাকে না। এর চেয়ে সভ্যতার দুর্দিন আর কি হতে পারে? ফলে কিছুতেই এ পরিস্থিতি চলতে দেওয়া যায় না।

এইসব কারণেই এস ইউ সি আই দলের কর্মীরা মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে লাঠি-গুলির সামনে দাঁড়িয়ে একের পর এক আন্দোলন করে যাচ্ছে। এ রাজ্যের সি পি এম ও অন্যান্য দলগুলি গদির লড়াইয়ে খেয়োখেয়িতে যখন মত্ত, তখন একমাত্র আমাদের দলের কর্মীরাই শীতে-গ্রীষ্মে-বর্ষায়, ঝড়ে-ঝাপ্টায়, দিনে-রাতে মার খেয়ে, বুকের রক্ত ঢেলে, প্রাণ বলি দিয়ে গণআন্দোলনের ঝাণ্ডা বহন করে যাচ্ছে। এই দলের কর্মীদের প্রেরণার উৎস কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য

২১ আগস্ট বাংলা বন্‌ধ সফল করুন

শিক্ষা — তিনি বলেছিলেন বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি, উন্নততর চরিত্র বিপ্লবী রাজনীতির প্রাণ। তিনি আরও বলে গেছেন, ব্যক্তি হিসাবে যদি তুমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে না পার, তাহলে তুমি মানুষ নামেরই যোগ্য নও। তাঁর অমূল্য শিক্ষাগুলি বুকে বহন করেই আমাদের কর্মীরা লড়াই করে যাচ্ছে।

বর্তমান আন্দোলনের কর্মসূচি

আপনারা জানেন, আমরা লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে চলেছি। আপনাদের সক্রিয় সমর্থনেই বিগত ২৭শে জানুয়ারি বাংলা বন্‌ধের ঐতিহাসিক সাফল্য এক উজ্জ্বল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। এরপর পঞ্চায়েত নির্বাচন এসে খুনোখুনি ও সন্ত্রাসের অন্ধকার সৃষ্টি করে, যার প্রতিবাদে গত ১৯শে মে আমরা রাজ্যব্যাপী সন্ত্রাসবিরোধী দিবস উদ্‌যাপন করি। বাসভাড়া কমানোর দাবিতে ২৩শে মে জেলাগুলিতে ও ৩০শে মে কলকাতায় পথঅবরোধ করি। মুর্শিদাবাদে শিশুমৃত্যুর প্রতিবাদে ১৯শে জুন শোকদিবস, মায়েদের মৌনমিছিল ও ২০শে জুন ২৪ ঘণ্টা মুর্শিদাবাদ বন্‌ধ করি। গত ২০শে জুন থেকে রাজ্যব্যাপী কয়েকদিন বিদ্যুতের বর্ধিত বিল বয়কট আন্দোলন হয় এবং আন্দোলনকারীদের ওপর কলকাতার তারাতলায় পুলিশের নৃশংস হামলার প্রতিবাদে ২৭শে জুন বেহালায় ১২ ঘণ্টা বন্‌ধ পালিত হয়। ২২শে জুন থেকে ৩০শে জুন পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় কৃষক ও খেতমজুরদের দাবিতে আর আই এবং বিডিও অফিসে অবস্থান ও ঘেরাও হয়। হায়ার সেকেণ্ডারিতে বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবিতে জেলায় জেলায় আন্দোলন হয় এবং গত ২৫শে জুন কোচবিহারের হলদিবাড়িতে এবং ৩রা জুলাই মেদিনীপুর শহরে আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ ও সি পি এমের সমাজবিরোধীদের হামলার প্রতিবাদে ২৬শে জুন হলদিবাড়ীতে বন্‌ধ এবং ৭ই জুলাই পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এরপর আগামী ১৯শে জুলাই রাজ্যব্যাপী সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭-৩০ মিঃ পর্যন্ত সর্বত্র বিদ্যুৎ আলো বয়কট, ২৫শে জুলাই রাজ্যব্যাপী শ্রমিকদের দাবিতে বিশাল বিক্ষোভ অবস্থান এবং ২৯শে জুলাই শিক্ষার দাবিতে সারা রাজ্যে ছাত্রধর্মঘট হবে, ৬ই আগস্ট স্বাস্থ্যসংক্রান্ত দাবিতে মেডিক্যাল কলেজে মায়েদের ও ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীদের অবস্থান হবে, ৬ই আগস্ট শিক্ষার দাবিতে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে শিক্ষকদের অবস্থান হবে। ১৩ই আগস্ট ছাত্র ও যুবকদের নানা দাবিতে কলকাতায় মহামিছিল হবে। তারপর ২১শে আগস্ট ২৪ ঘণ্টা বাংলা বন্‌ধ হবে। দাবি না মানলে বন্‌ধ পরবর্তীকালে আরও জোরদার আন্দোলন করা হবে।

গণকমিটি গঠন করুন

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কোন গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির ধার ধারে না, সেইজন্য কোন দাবি মানতে চায় না, তাই প্রয়োজন লাগাতার আন্দোলন। এই লাগাতার আন্দোলনকে সফল করতে হলে চাই গ্রাম ও পাড়া স্তর থেকে শুরু করে কারখানায়-অফিসে-ইনস্টিটিউশনে অসংখ্য গণকমিটি গঠন ও ভলাণ্টিয়ার সংগ্রহ। অতীতে কোন দলই আন্দোলনে গণকমিটি গঠন ও ভলাণ্টিয়ার সংগ্রহের আহবান দেয়নি, কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় একমাত্র আমাদের দলই দিচ্ছে। কারণ অন্য দলগুলি সবসময়ই আন্দোলনের নামে জনগণের বিক্ষোভকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে ব্যবহার করত, জনগণকে গদির রাজনীতির স্বার্থে উলুখড়ের মত ব্যবহার করত। সবসময়ই উপর থেকে নেতারা ইচ্ছামত প্রোগ্রাম ঠিক করে জনগণের উপর চাপিয়ে দিত, জনগণের মতামতের কোন তোয়াক্কা করত না। আমাদের দল সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে আন্দোলনগুলিকে গড়ে তুলছে। আমরা চাই জনগণের দাবিতে আন্দোলন নিয়ে জনগণই মাথা ঘামাবে। আমাদের দল আন্দোলন সংক্রান্ত কর্মসূচি জনগণের কাছে মতামতের জন্য রাখবে, যেমন আমরা এবারও বন্‌ধ সম্পর্কে জনগণের মতামত সংগ্রহ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি, উপর থেকে চাপিয়ে দিই নি। জনগণ বিচার করবে আন্দোলন ঠিকভাবে চলছে কি চলছে না, নেতৃত্ব ঠিক করছে কি করছে না। নেতৃত্ব ভুল করলে জনগণ শুধরে দেবে, এভাবে আমাদের দল জনগণ থেকে শিখবে, যেমন আমাদের মহান নেতা বলে গেছেন ; জনগণকে শিক্ষকের মর্যাদা দেবে। একই সাথে জনগণের মধ্যে যে যেমন যতটা যেভাবে পারে আন্দোলনের কাজেও সাহায্য করবে। এ কাজ সংগঠিতভাবে করতে হলে গণকমিটি চাই, যেমন এলাকায় এলাকায় ও নানা পেশায় নানা পাবলিক কমিটি আছে এবং তারা কাজ করে, তেমনি আন্দোলনের এই কমিটিও কাজ করবে। আর সাহসী, সৎ যুবকদের নিয়ে ভলাণ্টিয়ার বাহিনী গড়তে হবে যারা সাধ্যমত ও সুযোগমত যেমন পারে আন্দোলনে সাহায্য করবে। জনগণ যদি এভাবে সংঘবদ্ধ, সজাগ ও সক্রিয় হয় তাতে আন্দোলন যেমন জোরদার হয়, তেমনি কোন দলের সাধ্য থাকে না জনগণকে আগের মত অসংঘবদ্ধ ও অসচেতন রেখে ঠকাতে পারে। এমনকি এই কমিটিগুলি ও ভলাণ্টিয়াররা এলাকায় একদিকে নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক-কল্যাণমূলক কাজ করতে পারে, অন্যদিকে সন্ত্রাস, ডাকাতি ও নানা অসামাজিক কাজ প্রতিরোধ করতে পারে। অন্য দলগুলি চায়, জনগণ রাজনীতি নিয়ে, আন্দোলন নিয়ে মাথা না ঘামাক, ঘর-সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকুক আর ভাবুক 'আমরা আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নিয়ে কি করব'। জনগণ এমন থাকলে ওরা ইচ্ছামত ছড়ি ঘোরাতে পারবে, বলার ও বাধা দেওয়ার কেউ থাকবে না। আমাদের দল এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। এর ফলে দেশের অনেক ক্ষতি হয়েছে, আর যেন না হয়। তাই আমাদের এই আবেদন। আশা করি আপনারা এর গুরুত্ব বুঝে গণকমিটি গঠনে উদ্যোগী হবেন এবং বাড়ির ও এলাকার সৎ ও সাহসী ছেলেমেয়েদের ভলাণ্টিয়ার হতে উৎসাহ যোগাবেন।

ইতিপূর্বে প্রত্যেকটি আন্দোলনে আপনাদের আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতা আমরা পেয়েছি, এর জোরেই সরকারের এত আক্রমণ, নানা বাধা ও অপপ্রচার সত্ত্বেও আমরা আন্দোলনগুলি করতে পেরেছি। '৯০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর, '৯৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০০১ সালের ১০ই জানুয়ারী ও ২০০৩ সালের ২৭শে জানুয়ারী বন্‌ধ সফল করতে পেরেছি। আমরা বিশ্বাস করি, এবারও আন্দোলনের কর্মসূচিগুলি ও ২১শে আগস্টের ২৪ ঘণ্টার বাংলা বন্‌ধ একইভাবে আপনারা দৃঢ়তার সাথে সফল করবেন। আমরা আশা করি, সি পি এম সহ ফ্রন্টের অন্যান্য দলের এবং বিরোধী দলগুলির নিচুতলার কর্মী-সমর্থকরাও জনগণের স্বার্থে এই আন্দোলন ও বন্‌ধের কর্মসূচিকে অন্যবারের মত এবারও সফল হতে সাহায্য করবেন।

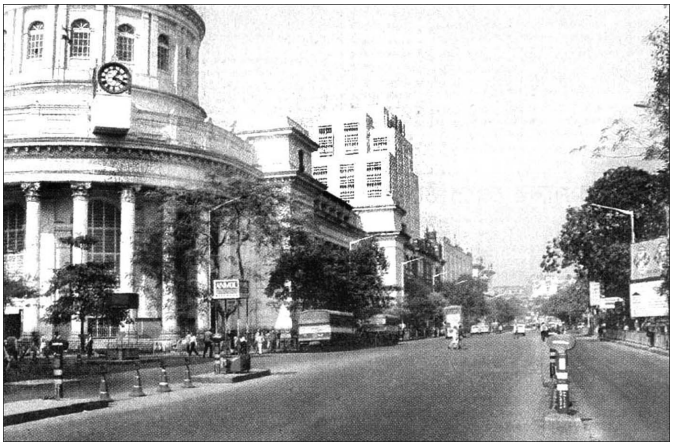

২৭ জানুয়ারি, ২০০৩ ঃ 'বন্‌ধ ব্যর্থ' সরকারি এই ঘোষণাকে বিদ্রূপ করে কলকাতার প্রাণকেন্দ্র সুনসান। জি পি ও-র ঘড়িতে তখন বেলা ১টা ২০ মিনিট

২১ আগস্ট ২৪ ঘন্টা বাংলা বন্‌ধের দাবি

১। বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল ও অতিরিক্ত সিকিউরিটি ডিপোজিট আদায় বন্ধ এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের গ্রাহক বিরোধী বিদ্যুৎ আইন বাতিল করতে হবে, জনপরিষেবায় ভর্তুকি তুলে দেওয়া চলবে না এবং বিদ্যুৎ পরিষেবার বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করতে হবে।

২। পরিবহনের বর্ধিত ভাড়া সম্পূর্ণ প্রত্যাহার, ১৫ই এপ্রিল থেকে নেওয়া অতিরিক্ত ভাড়া ফেরৎ নিয়ে যাত্রী কল্যাণ তহবিল গঠন, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা, মালিকদের আয়-ব্যয় পরীক্ষার জন্য বেসরকারী তদন্ত কমিটি গঠন, পরিবহন শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ, নির্দিষ্ট কাজের সময়, ন্যায্য মজুরি, বোনাস ও পি-এফের ব্যবস্থা করতে হবে। ডিজেলের উপর চাপানো কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ট্যাক্স ও সেস, পরিবহনের লাইসেন্স ও নবীকরণ ফি ও স্পেয়ার পার্টসের দামবৃদ্ধি প্রত্যাহার করতে হবে।

৩। শিক্ষার ব্যয়ভার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে বহন করতে হবে, উভয় সরকারের শিক্ষায় বরাদ্দ যথাক্রমে বাজেটের ১০ ও ৩০ শতাংশ করতে হবে। সকল বর্ধিত ফি, ডোনেশান ও ক্যাপিটেশন ফি প্রত্যাহার, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ, সকল ছাত্রের ভর্তির সুযোগ, ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক সেক্যুলার মানবতাবাদী শিক্ষা চালু, ইতিহাসের বিকৃতি বন্ধ, প্রাইমারিতে পাশ-ফেল প্রথা পুনরায় চালু, শূন্যপদগুলিতে স্থায়ী উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

৪। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বাজেট ১০ শতাংশ করা, হাসপাতালের বর্ধিত ফি ও চার্জ সম্পূর্ণ প্রত্যাহার, সমস্ত গরিবদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা, বেসরকারীকরণ বন্ধ, গ্রামাঞ্চলেও সরকারি আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, বিশিষ্ট চিকিৎসকদের নিয়ে কমিটি করে হাসপাতাল পরিষেবার উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ করতে হবে।

৫। সমস্ত বন্ধ কারখানা খোলা, ছাঁটাই শ্রমিক-কর্মচারীদের পুনর্বহাল, বেসরকারীকরণ-বিলগ্নীকরণ, পদের অবলুপ্তি ঘটানো, কনট্রাক্ট, ক্যাজুয়াল ও অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ, ৮ ঘণ্টার অধিক কাজ করান বন্ধ করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি শিল্প সংস্থার জমা না দেওয়া পি-এফের টাকা সম্পূর্ণ আদায় ও সকল কালাচুক্তি বাতিল করতে হবে। আইনভঙ্গকারী ও চুক্তি লঙ্ঘনকারী মালিকদের শাস্তি দিতে হবে। সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য বোনাস ও ডি-এ দেওয়া, শ্রমিক আন্দোলনে পুলিশী আক্রমণ বন্ধ করা, অসংগঠিত শ্রমিকদের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, স্থায়ী কাজ ও ন্যায্য মজুরির ব্যবস্থা করতে হবে, পুনর্বাসন ছাড়া হকার ও ঝুপড়ি উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে।

৬। বর্ধিত সেস্, সেচ কর, খাজনা, মিউটেশান-রেজিস্ট্রেশন ফি প্রত্যাহার, সার, ডিজেল, বিদ্যুৎ, কীটনাশক, অন্যান্য উপকরণের দাম কমানো, চাষির ফসলের ন্যায্য দাম, খেতমজুরের সারা বছর কাজ ও ন্যায্য মজুরী, বন্যা-খরা নিয়ন্ত্রণে স্থায়ী ব্যবস্থা, কারচুপি না করে সকল গরিবকে বি পি এল কার্ড দেওয়া, পঞ্চায়েতের দুর্নীতি বন্ধ, নয়া কৃষিনীতি বাতিল, নারী ও শিশুপাচার বন্ধ, গ্রামীণ উন্নয়নের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। জমির উর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়া চলবে না।

৭। খাদ্যশস্য সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করে গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষের ক্রয়ক্ষমতা অনুযায়ী সরবরাহ, কঠোর হাতে কালোবাজারি, মজুতদারী দমন, পুলিশ-প্রশাসনের দুর্নীতি বন্ধ, বর্ধিত নানা ট্যাক্স, জলকর, কোর্ট ফি, ট্রেড লাইসেন্স ফি, ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেণ্ট ফি প্রত্যাহার করতে হবে। পুলিশ বাজেট ও মন্ত্রী আমলাদের পিছনে অস্বাভাবিক ব্যয় কমাতে হবে, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের ছাড় দেওয়া টাকা আদায় করতে হবে।

এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মানিক মুখার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।